بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
14

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 ই এপ্রিল, 2017 6 শাহাদাত,1396 হিজরী শামসী ৮ রজব 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বড় হইয়া ছোটকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে।
বিদ্বান হইলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে।
ধনী হইলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে।
ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিবে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

বড় হইয়া ছোটকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে। বিদ্বান হইলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হইলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে। ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করিবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হইতে সংসার হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁহার জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা, তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন তোমার সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাকওয়ার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন তোমার জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিন অতিবাহিত করিয়াছ। জগতের অভিশাপকে ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূঁয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা দিনকে রাত করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লুহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর যাহা আকাশ হইতে অবর্তীণ হয় এবং যাহার উপর নিপতিত হয়, তাহার উভয় জগৎকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হইয়া যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকরের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে দূর করিয়া দিবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোথায়ও অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বিদ্যমান থাকে,তাহা হইলে আদৌ তোমরা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এইরূপ যেন না হয়-মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া এই বলিয়া তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা কর যে, 'যাহা কিছু করণীয় আমরা তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।' কেননা, খোদা তা'লা চাহেন যেন, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন যাহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নতুন জীবন দান করিবেন। তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং আপন ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজী নহে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে; কেননা,সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদিগকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থুলতা বর্জন কর; কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সেই দ্বার দিয়া কোন স্থুল-রিপু-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র মুখ-নিঃসৃত বাণী, যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইতেছে, তাহা মানে না! তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ,যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। খোদা তা'লার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অহঙ্কারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; বিশ্বাসঘাতক তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না;এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে,সে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যাহারা সংসারাসক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন তাহারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসাক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য কাঁদে, সে হাসিবে। যে তাঁহার জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসরমান হইয়া খোদা তা'লার বন্ধু হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্তদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও। যেন তিনি তোমাদের হইয়া যান।

(কিশতিয়ে নুহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭))

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শান্তির চাবিকাঠি-বিশ্ব ঐক্য

[সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ]

ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১২

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী ।

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ- আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক ।

প্রথমে আমি এ অনুষ্ঠানে আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাকে এখানে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আপনাদের সকলকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন । আমি আরও ধন্যবাদ দিতে চাই সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে যারা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত আছেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন ।

যারা আহমদীয়া মুসলিম জাম'াত বা সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতএমনকি তাঁরা যারা তুলনামূলকভাবে কম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু একক আহমদীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে থাকবেন যে, একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমরা সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি । আর নিশ্চিতভাবে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকি ।

আহমদীয় মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে যখনই সুযোগ আসে আমি নিয়মিত এ বিষয়গুলির উপর আলোচনা করে থাকি । আমি যে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বিষয়ে কথা বলে থাকি, তা এজন্য নয় যে আহমদীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কোন নতুন শিক্ষার আগমণ ঘটেছে । যদিও এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল কাজের মূল সেই শিক্ষার মধ্যে নিহিত যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর নিকট আবির্ভূত হয়েছিল ।

মহানবী (সা.)-এর যুগের পরবর্তী চৌদ্দশত বছরে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আনীত পবিত্র শিক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দীর্ঘদিন ভুলে যেতে বসেছিল । তাই প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরনে উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রেরণ করেন । আমি যখন বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষার কথা বলি, তখন আমার অনুরোধ যে, এ বিষয়টি আপনারা যেন দৃষ্টিপটে রাখেন ।

আমার আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শান্তি ও নিরাপত্তার একাধিক দিক রয়েছে । যেভাবে এর প্রতিটি আঙ্গিক নিজ সত্ত্বায় গুরুত্ব বহন করে, একই সাথে যেভাবে এ আঙ্গিকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণস্বরূপ সমাজের শান্তির মূল ভিত্তি পরিবার বা ঘরের শান্তি ও সৌহার্দ্য । ঘরের পরিবেশের প্রভাব ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রভাব স্থানীয় এলাকার শান্তির উপর পড়ে, যা আবার পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর শহর বা নগরীয় শান্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে । যদি ঘরে অশান্তি থাকে, তবে তা স্থানীয় এলাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তা আবার শহর বা নগরের উপর প্রভাব ফেলবে । একই ভাবে শহর বা নগরীয় অবস্থা পুরো দেশের উপর শান্তির উপর প্রভাব ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির অবস্থা পুরো অঞ্চল বা পুরো বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করবে । অতএব এটি স্পষ্ট যে, যদি আপনি শান্তির কোন একটি আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা করতে চান, তবে তার পরিধি সীমিত থাকবেন না,বরং তা ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকবে । অনুরূপভাবে, আমরা দেখে থাকি যে, যেখানে শান্তির অভাব রয়েছে, সেখানে বিদ্যমান সমস্যা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার যে আঙ্গিকটি লঙ্ঘিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন । এ বিষয়টি মাথায় রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এদের বিস্তারিত সমাধান প্রদান করার জন্য আমাদের হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন । তথাপি আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অন্ততঃ কিছু দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ।

আধুনিক পৃথিবীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং বিশ্বে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার জন্য এ ধর্মকে দায়ী করা হয় । যদিও ইসলাম শব্দটির অর্থই হল 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' তবুও এরূপ অভিযোগ করা হয়ে থাকে । উপরন্তু, ইসলাম সেই ধর্ম যা শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এটি অর্জনের জন্য কতকগুলো বিধি-বিধান প্রদান করেছে । ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার একটি চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপনের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই । আমি নিশ্চিত যে,আপনারা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন । তারপরও আমি এর অবতারণা করব, যেন আমি যখন ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার আলোচনা করবো তখন আপনাদের দৃষ্টিপটে এ বিষয়গুলো থাকে । আমরা সকলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ও স্বীকার করি যে, আজকের পৃথিবীতে এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে । আমরা সকলে নানাভাবে সংযুক্ত, তা আজকের দিনের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক অথবা মিডিয়া বা ইন্টানেট বা অন্যান্য বিবিধ মাধ্যমেই হোক । এ সমস্ত কারণে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেশগুলি একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে । আমরা দেখি যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে সকল গোত্র, ধর্ম ও জাতিসত্ত্বার মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং একত্রে বাস করছে । সত্যিই আজ অনেক দেশ ভিন্ন দেশ হতে এসে অভিবাসন গ্রহণকারী জনসংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । অভিবাসন গ্রহণকারীরা এমনভাবে সমাজের মধ্যে সমন্বিত হয়ে গেছে যে সরকার বা স্থানীয় জনগণের পক্ষে তাদেরকে সরানো এখন অতীব দুষ্কর এমনকি অসম্ভব । যদিও অভিবাসনের সুযোগকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপও করা হয়েছে । তথাপি এমন অনেক উপায় রয়ে গেছে যার মাধ্যমে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারে । বস্তুতঃ অবৈধ অভিবাসনকে যদি বাদও দেওয়া হয়, আমরা দেখি যে কতকগুলো আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান যা যথার্থ কারনে যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয় তাদের সপক্ষে কাজ করে ।

আমরা আরও লক্ষ করি যে, গণ-অভিবাসনের ফলে কোন কোন দেশে অস্থিরতা ও টানাপোড়েন ছড়িয়ে পড়ছে । এর জন্য উভয় পক্ষই দায়ী- অভিবাসী এবং স্থানীয় জনগণ । একদিকে অভিবাসীগণের একাংশ তাদের নতুন দেশের সমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্থানীয়দের উসকে দেয়; আর অপরদিকে স্থানীয়দের একাংশের মাঝে সহিষ্ণুতা ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয় । সময়ে সময়ে এ ঘৃণা বাড়তে বাড়তে খুবই মারাত্ম পর্যায়ে পৌঁছে যায় । বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগতে কতক মুসলমানের বিশেষত অভিবাসীগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে স্থানীয়দের ঘৃণা ও শত্রুতা অনেক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ পায় । এই ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া কেবল ক্ষুদ্র মাত্রায় সীমিত নয়, বরং চরম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে এবং হয়েও থাকে, আর এ কারণেই পাশ্চাত্য নেতৃবর্গ নিয়মিতভাবে এই সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রেখে থাকেন । সুতরাং আমরা দেখি যে, কখনো জার্মানা চান্সেলর মুসলমানদের জার্মানীর সাথে একাত্ম হওয়ার বিষয়ে কথা বলছেন; কখনো বা আমরা দেখি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সমাজে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন; আর কোন কোন দেশের নেতৃবৃন্দ তো মুসলমানদের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত দিয়েছেন । বিদ্যমান সংঘাতসমূহের ভিতরের অবস্থার গুরুতর অবনতি যদি নাও হয়ে থাকে, অন্ততঃ উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে । এই বিষয়গুলি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং শান্তিকে বিনষ্ট করার পথে নিয়ে যেতে পারে । এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এমন সংঘাতের প্রভাব পশ্চিমা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না. বরং পুরো পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের উপর । এর ফলে পাশ্চত্য ও প্রাচ্যের জগতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি হবে । অতএব এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ও শান্তির বিস্তারের জন্য সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে । সরকারগুলোকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যের অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাত বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত ।

অভিবাসীগণের বিষয়ে বলব যে, স্থানীয় লোকদের সাথে একাত্ম হওয়ার সদিচ্ছা নিয়েই তাদের এদেশে প্রবেশ করতে হবে, আর অপরপক্ষে স্থানীয়দের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । উপরন্তু মুসলমানদের উপর কেবল কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেই তা শান্তির পথে নিয়ে যাবে না, কেননা,এর দ্বারা মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা যায় না । এটি কেবল মুসলমানদের বিষয় নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম বা বিশ্বাসের জন্য জোরপূর্বক অবদমিত করা হয়, তখন এর এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যার ফলে শান্তি গুরুতর ভাবে বিঘ্নিত হবে । যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন কোন দেশে সংঘাত বাড়ছে, বিশেষ করে স্থানীয় মানুষ এবং মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে । এটা স্পষ্ট যে, উভয় পক্ষ ক্রমে ক্রমে পূর্বাপেক্ষা কম সহনশীল হয়ে উঠছে এবং একে অপরকে জানার বিষয়ে একরূপ অনীহা রয়েছে । ইউরোপীয় নেতৃবর্গকে এটা মেনে নিতে হবে যে, এটিই বাস্তবতা এবং উপলব্ধী করতে হবে যে পারস্পরিক ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে । এটি অত্যাবশ্যকীয়, যেন প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে এবং ইউরোপীয় ও মুসলমান দেশসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ গড়ে উঠে এবং বিশ্বের শান্তি যেন চূর্ণ বিচূর্ণ না হয় ।

আমি বিশ্বাস করি যে এসব সংঘাত ও বিভক্তির কারণ কেবল ধর্ম বা বিশ্বাস নয় এবং এটি কেবল পাশ্চাত্য ও মুসলমান দেশসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন নয় ।

প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের গোড়ার কারণের মধ্যে বড় একটি হল বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকট । যখন কোন মন্দা বা ঋণ সংকট ছিল না তখন কোন দিন কেউ

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

ছেলে এবং মেয়েদের দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বিবাহের পর পারিবারিক সমস্যা, এগুলো এমন বিষয় যা ঘরে দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। বিয়ের পর পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়াদি বা সমস্যাবলী শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং উভয় পক্ষের পিতা-মাতার জন্যও দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। আর শুধু এতটাই নয়, বরং যদি সন্তান হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের মাঝেও তা দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির সূত্রপাত ঘটায়।

বিয়ে-শাদির বিষয়ে এবং বিয়ের পর তৈরি হওয়া বিভিন্ন পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সমস্যাবলীর কারণ সনাক্ত করে সেগুলির প্রতিকারের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে উপদেশাবলী।

যদি একবাক্যে এই বিভিন্ন বয়ঃসীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত দাম্পত্য সমস্যার কারণ উল্লেখ করা হয় তাহলে তা হবে– ধর্মের সাথে দূরত্ব, ধর্মীয় শিক্ষার জ্ঞান না থাকাএবং আগ্রহের অভাব, আর জাগতিকতা ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। অতএব এসব বিষয়ের যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের তা করতে হবে।

একদিকে আমরা নিজেদেরকে আহমদী বলি আর দাবি করি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এমনই যদি হয়ে থাকে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের এর সমাধান সন্ধান করতে হবে, যা আমরা কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় পাই।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩রা মার্চ , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৩ আমান, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ,তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:ছেলে এবং মেয়েদের দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বিবাহের পর পারিবারিক সমস্যা, এগুলো এমন বিষয় যা ঘরে দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। বিয়ের পর পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়াদি বা সমস্যাবলী শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং উভয় পক্ষের পিতা-মাতার জন্যও দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। আর শুধু এতটাই নয়, বরং যদি সন্তান হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের মাঝেও তা দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির সূত্রপাত ঘটায়। আর অনেক সময় এ কারণে সন্তান-সন্ততি জাগতিক এবং ধর্মীয়– উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নষ্ট হতে থাকে, আর পিতা-মাতা ও পরিবারের জন্য অধিক দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকে। এভাবে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও পেরেশানীর এক ধারা সূচিত হয়। প্রায় প্রতিদিনই আমার চিঠিপত্রে এমন বিষয়াদি সামনে আসে বা সাক্ষাতের সময় মানুষ তাদের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে থাকে।

একদিকে মেয়েদের বিয়ের সমস্যা রয়েছে। পড়ালেখার অজুহাতে সঠিক বয়সে মেয়ের বিয়ে দেয়া হয় না; যখন মেয়ের বিয়ের বয়স হয় তখন এই অজুহাত দাঁড় করানো হয় যে, এখন সে পড়ালেখা করছে। আর যখন বিয়ে হয়, বয়স বেড়ে গেলে পড়ালেখার পর যখন বিয়ে হয়, তখন পারস্পরিক বোঝাপড়া না হওয়ার যৌক্তিকতা দেখিয়ে ছেলে-মেয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সম্পর্কের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়।

এরপর কোন কোন মেয়ের ক্ষেত্রে এমন কথাও সামনে এসেছে যে, তাদের এমন অনেক বান্ধবী এবং বন্ধু আছে যারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা তাদের মাঝে ফুৎকার করে যে, এ দেশে তোমার অনেক প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, স্বামীকে বল যে আমার অধিকার দাও, এই দাও, সেই দাও- নতুবা আমি তোমাকে আমার স্বামী মানি না; আর স্বামীর সব কথা মানাও উচিত নয়। এছাড়া অনেক সময় পিতা-মাতা নিজেরাও মেয়েদের এমন কথা শিখিয়ে থাকে, যার ফলে ছেলে-মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস হারিয়ে যায়,অথবা বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ সামনে আসতে থাকে বা হৃদয়ে দানা বাঁধে।

পরিতাপের বিষয় হল, পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত মেয়ে বিয়ে হয়ে এখানে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে আসে,তারা এখানকার স্বাধীনতা দেখে, সমাজের রঙে রঙিন হয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত দাবি-দাওয়া উত্থাপন আরম্ভ করে । বরং অনেক সময় ঘর আবাদ করার পূর্বেই এখানে এসে সম্পর্কচ্ছেদ করে । আর এটি শুধু মেয়েদেরই চিত্র নয় বরং ছেলেরাও এমনটি করছে । বরং ছেলেদের এমন কর্মকা-ের অনুপাত মেয়েদের চেয়ে হয়তো একটু বেশিই হবে । আর এর কারণ হল, অধিকাংশ ছেলে এবং মেয়েরাও সোজা, সরল এবং সৎ কথা বলে না, যার সাথে বিবাহ-শাদীর বা দাম্পত্য জীবনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিয়ের সময় যেই আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সেগুলোতে সোজা, সঠিক এবং সত্য কথা বলার উপর বিশেষ জোর রয়েছে। দুই পক্ষের সামনে পুরো চিত্র তুলে ধরা হয় না। এছাড়া পিতা-মাতা অনেক সময় মেয়েদের উপর এই অজুহাতে চাপ সৃষ্টি করে বিয়ে দেয় যে, পরে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শিক্ষাগত পার্থক্য এবং জীবন-যাত্রার মানের ভিন্নতার কারণে দুই পরিবারের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে না।

অনুরূপভাবে অনেক ছেলের অন্য জায়গায় আগ্রহ থাকে; কিন্তু পিতা-মাতার সামনে স্বীকার করে না আর পাকিস্তানে বিয়ে করে ফেলে বা এখানে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মাঝে তাদের ইচ্ছা বা পছন্দমত বিয়ে করে, আর কিছুকাল পর সেই সমস্ত মেয়েদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথমে তার স্বামীর পক্ষ থেকে অত্যাচার হয়, তারপর সেইশ্বশুর বাড়ির মানুষই বা যে শাশুড়ি বড় আগ্রহের সাথে পুত্রবধুকে নিয়ে এসেছিল, তার পক্ষ থেকেই অত্যচার করা হয়। এরপর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকেও অত্যাচার করা হয়। যাহোক, ছেলে হোক বা মেয়ে, ছেলের শ্বশুর পক্ষ হোক বা মেয়ের শ্বশুর পক্ষ–এসব বিষয়ের জন্য কাউকে একশত ভাগ দায়ী করা যাবে না বা পুরো দোষ এক পক্ষের নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে দোষী হয়ে থাকে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা দোষী হয়ে থাকে।

এরপর, আমি যেভাবে বলেছি, পারিবারিক সমস্যা দিসন্তান-সন্ততির উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন কয়েকটি সন্তানের জন্ম হওয়ার পর, দীর্ঘকাল সুন্দরভাবে জীবন যাপনের পর হঠাৎ পুরুষের মাথায় পোকা ঢুকে আর সে বলে যে, এই স্ত্রীর সাথে আমার চলবে না, তাই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছি বা তোমাকে তালাক দিতে যাচ্ছি; বা এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী বলে যে, আমি বড় কষ্টের মাঝে এই ব্যক্তির সাথে জীবন কাটিয়েছি, এখন আর সহ্য করতে পারছি না, তাই আমাকে খোলা নিতে হবে। এখানে আমি এ কথাও স্পষ্ট করতে চাই যে, জামা'তে তালাকের চেয়ে খোলা নেয়ার হার বেশি; অর্থাৎ বিচার বিভাগে বা কাযা-তে তালাকের চেয়ে খোলা নেয়ার আবেদন বেশি আসে। যাহোক, এমন পরিস্থিতিতে সন্তান-সন্ততির উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আর জাগতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে, তাদের তথ্য থেকেও এ কথা প্রমাণিত যে, পিতা-মাতার সম্পর্কচ্ছেদের পর সন্তান যার কাছেই থাকুক, তাদের উপর মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক আর অন্যান্যযোগ্যতা বা গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাব পড়ে। যাহোক এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতির জন্য যে-ই দায়ী হোক না কেন; ছেলে যদি মেয়েকে দোষারোপ করে বা স্বামী যদি স্ত্রীকে দোষারোপ করে, আর এই বলে দোষারোপ করে যে, পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিত মেয়েরা নিজেদের পেশার নামে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে এবং সঠিকভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না, অথবা প্রথম দিকে আমরা বিভিন্ন কারণে পিতা-মাতার সাথে থাকতে চাই, কিন্তু মেয়েরা থাকতে চায় না, বা তাদের ধর্মের জ্ঞান নেই, বা অনেক সময় ছেলেরকাছে অন্যায় প্রত্যাশা রাখা হয় আর বলা হয় যে, তাৎক্ষনিকভাবে

নতুন ঘর ক্রয় কর, আর এমন ঘর হওয়া উচিত যা তোমার নিজের সম্পত্তি হবে।

এছাড়া পিতা-মাতাও ছেলে-মেয়ের দাম্পত্য জীবনে হস্তক্ষেপ করে।

আবার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত না করার কারণে এবং সত্য ও সরল কথা না বলার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, সত্য এবং সঠিক ও সরল কথার ভিত্তিতে কার্য সাধন করা হয় না, যা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে মেয়েদের হৃদয়ে ছেলে এবং তার পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক কথা থেকে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছেলের মা বা আত্মীয়-স্বজন মেয়ের সামনে বা পুত্রবধুর সামনে সবসময় ছেলের প্রশংসা করতে থাকে যে'আমাদের ছেলে এমন, আমাদের ছেলে তেমন'; আর মেয়েকে কোন না কোনভাবে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, যেমন বলা হয়, বেঁটে, মোটা, রং ফর্সা নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি মেয়ে কোন কারণে চাকরি করে তাহলেও তাকে খোঁটা দেয়া হয়। পুনরায় ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতেও ছেলেপক্ষ নাক গলিয়ে থাকে। এছাড়া মেয়েরা এই অভিযোগও করে যে,বিয়ের ফলে ছেলেদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় সেই দায়িত্ব তারা পালন করছে না,তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ নেই। আর ছেলেরা সাধারণত এখানকার সমাজের প্রভাবে, যাদের বয়স ২৫ বা ২৬ বছর হয়ে গেছে হয়ে গেছে তাদেরকেও যদি বলা হয়, তোমার বয়স হয়ে গেছে, তাহলে বলে যে, 'না, আমার বয়স কম, বিয়ের বয়স হয় নি'। এখানকার সমাজের প্রভাবে আমাদের আহমদী ছেলেদের মাঝে, বিশেষ করে এশিয়ান বংশোদ্ভূত ছেলেদের মাঝেও এই ব্যাধি রয়েছে, তারা বলে থাকে যে, 'আমাদের বয়স এখনো কম, আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারবো না'। বয়স যদি কম হয়ে থাকেআর দায়িত্ব যদি পালন করতে না পারে, তাহলে বিয়ে করার প্রয়োজন কী? যাহোক, অভিযোগ অনুযোগের এই ধারা উভয় পক্ষ থেকে উত্থিত হয় এবং হতে থাকে।

একইভাবে বেশ কয়েক বছর দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর, আমি যেভাবে বলেছি, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর অভিযোগের ধারণা সৃষ্টি হয়, আর নিছক শিশুসুলভ কথাবার্তা বলা হয়; আর এ ধরনের কথার কারণ অধৈর্য এবং অন্যায় বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। যদি একবাক্যে এই বিভিন্ন বয়ঃসীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত দাম্পত্য সমস্যার কারণ উল্লেখ করা হয় তাহলে তা হবে– ধর্মের সাথে দূরত্ব, ধর্মীয় শিক্ষার জ্ঞান না থাকাএবং আগ্রহের অভাব, আর জাগতিকতা ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। অতএব এসব বিষয়ের যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের তা করতে হবে।

একদিকে আমরা নিজেদেরকে আহমদী বলি আর দাবি করি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এমনই যদি হয়ে থাকে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের এর সমাধান সন্ধান করতে হবে, যা আমরা কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় পাই। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি,আমরা মুসলমান। আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা মেনেছি, যিনি আমাদের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছেন। এই অঙ্গীকার আমরা বিভিন্ন সময় পুনরাবৃত্তিও করি, কিন্তু যখন একে কার্যে রূপায়িত করার সময় আসে তখন আমরা ভুলে যাই। বিয়ে-শাদীর সময় ভালো ও সম্মানিত মানুষ, যারা বাহ্যত ধর্মের সেবক,তারাও এটিকে ভুলে যায়। অথচ বিয়ে-শাদী এবং বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে তো আমরা মহানবী (সা.) থেকে বিশেষ দিকনির্দেশনাও পেয়েছি যে, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে যদি কারো জাগতিক স্বার্থসিদ্ধিও হয়, তাহলে এটি খোদার কৃপা। আর বস্তুবাদী লোকদের ভাষায় যদি বলতে হয় তাহলে আমরা বলবো এটি একটি বোনাস। কিন্তু যদি শুধু জাগতিকতার উপরই চোখ থাকে আর অপরদিকে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার দাবি করা হয়, তাহলেসমস্যা মাথাচাড়া দেয়। কেননা, এমনটি করলে সত্যকে বিসর্জন দেয়া হয়, সততা তখন আর থাকে না। অতএব মহানবী (সা.)-এর এই কথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রসূলে করীম (সা.)-এর ভাষায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়; প্রথমত তার সম্পদের কারণে, দ্বিতীয়ত তার বংশের কারণে, তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তার ধার্মিকতার কারণে; অতএব তোমরা ধার্মিক মেয়ে নির্বাচন কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।' (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ) এ কথা যদি ছেলেরাও এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও সামনে রাখে, তাহলে মেয়েরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই ধর্মকেই প্রাধান্য দেবে। আর ধর্ম যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ যা মেয়ে এবং ছেলে এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে পরস্পরের মাথায় দানা বাঁধে, তা দূর হয়ে যাবে। আর যেই ছেলে ধার্মিক মেয়ের সন্ধানে থাকবে আর ধর্মকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে, তাকে নিজের আমল বা ব্যবহারিক আচার-আচরণও ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত করতে হবে। আর যে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তার ঘরে বিনা কারণে ছোট ছোট বিষয়ে ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না। আর ছেলেপক্ষও মেয়ের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

পুনরায় ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, নিঃসন্দেহে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া পছন্দনীয়। তাসত্ত্বেও সব ছেলে সব মেয়ের জন্য উত্তম হয় না। তাই বিয়ের পূর্বে ইস্তেখারা করে নাও। (বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত)

আল্লাহ্ তা'লার কাছে সেই সম্পর্কের জন্য কল্যাণ কামনা কর, বা খোদার দৃষ্টিতে যদি এই সম্পর্ক স্থাপন কল্যাণকর না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা হতে না দেন বা তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে বলেছেন যে, "মহানবী (সা.) অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যদি এরউপর আমল করি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বিয়ে অবশ্যই সুখের কারণ হবে, আর কুরআনে বিয়ের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা যেন প্রশান্তি ও ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়, তা সৃষ্টি হবে। বিয়ে-শাদী এজন্য করা হয় যেন পরস্পরের জন্য প্রশান্তির কারণ হয় এবং প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, প্রথম যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হল বিয়ের উদ্দেশ্য হল ধর্ম, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া উচিত, তা-ই কর। সৌন্দর্যের মোহে আচ্ছন্ন বা ধন-সম্পদের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ বা শুধু উচ্চ বংশ যেন উদ্দেশ্য না হয়। প্রথমত নিয়্যত যেন নেক হয়, এরপর দ্বিতীয় কাজ হল বিয়ের পূর্বে অনেক ইস্তেখারা কর।"

(খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ৫১৮-৫১৯)

অতএব বিয়ের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রশান্তি এবং ভালোবাসাপূর্ণ জীবনের জন্য যদি মানুষ দোয়া করে আর যদি এই দোয়া করে যে, 'হে আল্লাহ্! এতে যদি আমার জন্য প্রশান্তি এবং কল্যাণের উপকরণ থাকে তাহলে যেন এই বিয়ে হয়'। তাহলে দাম্পত্য জীবন খোদা তা'লার ফযলে অত্যন্ত সফল কাটে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, বিয়ের পরও শয়তান বিভিন্নভাবে হামলা করতে থাকে। তাই এই দোয়া সবসসময় করতে থাকা উচিত যে, বিয়ে বা দাম্পত্য জীবন যেন সবসময় শান্তি, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার মাঝে অতিবাহিত হয়।

পুনরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইস্তেখারার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষভাবে নসীহত করেছেন যে, "বড় বড় কাজগুলোর একটি হল বিয়ে, এটি কোন সামান্য কাজ নয় বরং এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধিকাংশ মানুষের এই বাসনা থাকে যে, বড় বংশের ছেলে বা মেয়ে হওয়া উচিত,বংশ যেন উন্নত হয়, তার ধন-সম্পদ থাকা উচিত, যশ এবং খ্যাতি থাকা উচিত, সৌন্দর্য ও যৌবনও যেন থাকে। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সা.) বলেন যে, চেষ্টা কর যেন ধার্মিক মানুষ লাভ হয়, ছেলে হোক বা মেয়ে। আর যেহেতু চরিত্র, অভ্যাস এবং সততার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা কঠিন হয়ে থাকে, অর্থাৎ কারো চরিত্রের কথা তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না; "(অনেক বিয়ে-বিচ্ছেদের পেছনে কারণ হিসেবে বলা হয় যে, আমরা এটি দেখে সম্বন্ধ করেছি যে, বাহ্যত ধার্মিক-চরিত্রবান, কিন্তু পরে বোঝা গেছে যে, সবকিছুই ভ্রান্ত; তাই যেহেতু পূর্বে জানা যায় না বা জানা সম্ভব হয় না,) "সেহেতু ইস্তেখারা অবশ্যই কর।"

(খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ২৫৪)

তিনি বলেন যে, "আমরা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকি। কিন্তু খোদা তা'লা হলেন আলেমুল গায়েব,তিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন। তাই প্রথমত ভালোভাবে ইস্তেখারা কর আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাও।" (খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ৪৭৮)

বিয়ের খুতবায় যেসমস্ত আয়াত পঠিত হয় সেগুলোর প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন যে, "এগুলোতে এই নসীহত রয়েছে যে, তাকওয়াকে সামনে রেখে আত্মীয়তার বন্ধন বা রক্ত সম্পর্কের বিষয়ে সাবধান হও। সহজ, সরল ও সত্য কথা বল। আর এটি দেখ যে আমি নিজের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছি। জীবনে সাফল্য যদি পেতে চাও তাহলে তাকওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয় দৃষ্টিতে রেখে তিনি বিয়ের খুতবায় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সে সম্পর্কে বলেন যে, ইস্তেখারার পর যখন বিয়ের সময় আসে, এই আয়াতগুলোতে সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সে যেন এই দোয়াগুলো করে এবং নিজের কর্মের পরিণাম সম্পর্কে যেন চিন্তা করে আর ভাবে। এরপর বিয়ের শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া শিখিয়েছেন যে, 'বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফিল খায়ের'। (জামে তিরমিযি কিতাবুন নিকাহ) অর্থাৎ 'আল্লাহ্

তোমাদের আশিসমণ্ডিত করুন, তোমাদের উভয়ের উপর আশিস বর্ষণ করুন। আর তোমাদেরকে পুণ্যে সমবেত করুন'। (খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ৫১৯-৫২০) অতএব যদি সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ এবং বরকতের বা মঙ্গলের দোয়া করা হয়, তাহলেই সম্পর্ক বরকত এবং কল্যাণ বয়ে আনে। অনেকেই পাক-ভারতীয় প্রভাবের অধীনে এখনো জাত-পাত বা বংশের চক্রে বা আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, বিয়ের প্রস্তাব আসলে দোয়া কর এবং ইস্তেখারা কর, ধর্মকে প্রাধান্য দাও। তাই কোথায় দোয়া করবে, ধর্মকে প্রাধান্য দিবে– এই বিষয়গুলো তাদের সামনে থাকে না; বরং জাতি, বংশ, গোত্র বা জাত-পাতকে তারা সামনে রাখে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় শুধু এটি দেখা উচিত যে, যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে সে পুণ্যবান বা পুণ্য চালচলনের কিনা,আর এমন কোন ব্যাধি নেই তো যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে। আর স্মরণ রাখা উচিত, ধর্মের আঙিনায় জাত-পাত বা বংশের কোন গুরুত্ব নেই। শুধু তাকওয়া এবং পুণ্য প্রকৃতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬)

অতএব এই হল মৌলিক নীতি যে তাকওয়া বা খোদা ভীতিকে প্রাধান্য দাও, বাকি সবকিছু বিদআত। অবশ্য কুফভ বা দুই পরিবারের মাঝে সামঞ্জস্য ও সমতার দিকটা দেখার নির্দেশ রয়েছে, তাই এটি দেখা উচিত। কিন্তু এটিও কঠোরভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত নয়।

এ বিষয়ে কতটা কঠোর হওয়া যায় সে প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কারো প্রশ্ন করা এবং তাঁর (আ.) উত্তর দেখতে পাই। "এক বন্ধুর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এক আহমদী তার এক মেয়ে অসম সামাজিক মর্যাদার এক আহমদীর কাছে দিতে চায়, অথচ সমান সামাজিক মর্যাদার আহমদীও রয়েছে; এ সম্পর্কে আপনার শিক্ষা কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, যদি পছন্দসই সম্পর্কের সুযোগ আসে তাহলে 'কুফভ' বা সমান সামাজিক মর্যাদার পরিবারে বিয়ে করা উত্তম। কিন্তু এই বিষয়টি আবশ্যক নয়। এটি আবশ্যক নয়, কিন্তু উত্তম। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক আহমদী এমন বিষয়ে নিজের কল্যাণ এবং সন্তানের স্বার্থকে বা মঙ্গলের দিকটাকে ভালো বোঝে। যদি মর্যাদার দিক থেকে সমান কাউকে না পায় তাহলে অন্যত্র মেয়ে দিতে অসুবিধা নেই। এমন ব্যক্তিকে তার সমান মর্যাদার পরিবারে মেয়ে দিতে বাধ্য করা বৈধ নয়।" (আল বদর, ১১ই এপ্রিল ১৯০৭)

অনেকেই নিজের বংশ নিয়ে বড় গর্ব করে। এমনই এক ব্যক্তিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার কঠোরভাবে ধৃত করেন। একদিকে দাবি করে, অপরদিকে তার অবস্থা দেখুন। হযরত খলীফা সানী (রা.) বলেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে একবার এক ব্যক্তি আসে আর বলে যে, আমি সৈয়্যদ, আমার মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। আপনি এ উপলক্ষ্যে আমায় কিছুটা সাহায্য করুন। তিনি বলেন যে, আমি তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য সেই সমস্ত উপহারবা উপঢৌকন তোমাকে দিতে প্রস্তুত রয়েছি যা মহানবী (সা.) নিজ কন্যা ফাতেমাকে দিয়েছিলেন। এটি শুনতেই সেই ব্যক্তি অবলীলায় বলা আরম্ভ করে, আপনি কি আমার নাক কাটাতে চান? তো যৌতুক বা উপহার-উপঢৌকনের প্রচলন এত বেশি, আরএর কারণে অনেক সমস্যারও সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন যে, 'তোমার নাক কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়েও বড় বা দীর্ঘ? তোমার সম্মান সৈয়্যদ হওয়ার মাঝে নিহিত। এরূপ উপঢৌকন দেয়ার ফলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যদি অসম্মান না হয় তাহলে তোমার অসম্মানকিভাবে হতে পারে?"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০)

একদিকে বলছ যে তুমি সৈয়্যদ, তাহলে আবার অসম্মান বা অবমাননা কিসের?'

তো অনেক সময় মেয়েরা এমন খোঁটা এবং খোঁচাও শুনে যে, তোমার যৌতুক কম। এটি তাদের জন্যও শিক্ষনীয় বিষয় যারা মেয়েদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হানে। অনুরূপভাবে মেয়েপক্ষেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, যতটাসাধ্য আছে মেয়েকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম বা উপহার-উপঢৌকন দেওয়া উচিত, কিন্তু অকারণে নিজের উপর বোঝা টেনে আনা উচিত নয়।

ইস্তেখারার পূর্বে যেখানে বিয়ের বা সম্পর্ক করার ইচ্ছা হয় , সেই মেয়েকে দেখাও উচিত। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, সে আনসারের এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বললো যে, না, দেখি নি। রসূলে করীম (সা.) বলেন যে, প্রথমে তাকে দেখে আস, কেননা আনসারের চোখে কোন জিনিস থাকে।"(সহী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ)

অতএব মেয়ে দেখা, মেয়েপক্ষের ঘরে গিয়ে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন কোন ছেলেপক্ষ অহঙ্কারবশতঃ মেয়েদের ঘরে নিজের ছেলে নিয়ে যায় যে, আমরা মেয়ে দেখতে এসেছি কেননা রিশতানাতা দপ্তর এই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আর এরপর আমি যেভাবে বলেছি, সেখানে গিয়ে অহঙ্কারবশতঃ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা অদ্ভুত প্রকৃতির হয়ে থাকে;অথচ তারা পূর্বে ছবিও দেখে থাকে, বায়োডাটাও আদান প্রদান হয়ে থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও বিষয়কে দীর্ঘায়িত করে। আর এ সময়ের ভিতর জাগতিকভাবে কোন ভালো প্রস্তাব আসলে পূর্বের প্রস্তাবকে তারা উপেক্ষা করে। এটি একটি ভ্রান্ত রীতি।

অধিকাংশ আহমদী মেয়ে নিজেদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে। আর তারা যেসব জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেন তা শিরোধার্যও করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেপক্ষ আসে, আর আমি যেভাবে বলেছি, দেখার পর তারা কথা বলা বন্ধ করে দেয়। যখন ছবিও দেখলে, বায়োডাটাও দেখলে, সবকিছু জানতে পারলে যে উচ্চতা কতটুকু, গঠন-গড়ন কেমন– এরপর বিনা কারণে কথা দীর্ঘ করে বা এমন আজেবাজে কথা বলে মেয়ের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানা উচিত নয়।

ধর্ম বিয়ের যে উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে তা যদি মেনে চলা হয়, তাহলে মেয়েদের আবেগ অনুভূ তিতে আঘাত আসার কথা নয়। আর ছেলে বা তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে অহঙ্কার প্রদর্শনবা আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলার ঘটনা ঘটত না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'কুরআন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পরহেযগার থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে কর। বিয়ের উদ্দেশ্য কী? বিয়ের উদ্দেশ্য হল পরহেযগার থাকা। আর বিয়ে হওয়ার পর নেক সন্তান লাভের জন্য দোয়া কর। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেন যে, مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ (সূরা আন্-নিসা: ২৫) অর্থাৎ তোমাদের বিয়ে এজন্য হওয়া উচিত যেন তোমরা তাকওয়া এবং পরহেযগারীর দুর্গে প্রবেশ কর। মুহসেনীন-এর একটি অর্থ হল, যে বিয়ে করে না সে কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাধিতেই নিমজ্জিত হয় না, বরং দৈহিক রোগ-ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়। অতএব, কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের তিনটি উপকারিতা রয়েছে, আর এই উদ্দেশ্যেই বিয়ে করা উচিত। সেগুলো কী? একটি হল পবিত্রতা ও পরহেযগারী অর্জন, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, আর তৃতীয়টি হল সন্তান বা বংশবিস্তার।" (আর্য ধরম, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০)

অতএব এই কথাগুলো যদি সামনে থাকে তাহলে সম্পর্ক করার সময় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। জাগতিকতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে মানুষের প্রথমে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত, আর এসব বিষয় সামনে রেখে বিয়ে করা উচিত।

কোন কোন ঘরে ঝগড়া-বিবাদ আর অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল– বিয়ের পর মেয়ে যখন স্বামীর কাছে আসে তখন স্বামীর কাছে আলাদা বাড়ি থাকে না, তাই সে নিজের পিতা-মাতার সাথে বসবাস করে; কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতাও থাকে, পৃথক ঘর ভাড়া করার মত ছেলের অতটা আয়-উপর্জন নেই, আর ছেলে যদি ছাত্র হয় তাহলেও বাধ্যবাধকতা থাকে। আর মেয়েরও জানা থাকা উচিত যে, ছেলের স্বল্প আয় বা বাধ্যবাধকতার কারণে পৃথক ঘর নেওয়া কঠিন। আর এমন পরিস্থিতিতে কিছু দিন তার শ্বশুর বাড়িতে থাকা উচিত। কিন্তু অনেক সময় এই কারণে মেয়ে এবং তার পিতা-মাতা তড়িঘড়ি করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়, অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর খোলা নিয়ে নেয়। এগুলো ভ্রান্ত রীতি। শ্বশুরবাড়িতে যদি থাকতে না পারে তাহলে পূর্বেই বলা উচিত, আর এত তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে করা উচিত নয়। কেননা, ছেলের অবস্থা এর অনুমতি দেয় না।

কিন্তু কোন কোন ছেলে নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বভাব বা প্রকৃতির বশেঅথবা পিতা-মাতা বলার কারণে বা তাদের চাপ প্রয়োগের ফলে তাদের সাথে থাকে, অথচ তারা পৃথক ঘর ভাড়া করতে পারে; আর অজুহাত দেখায় যে, পিতা-মাতা বয়ঃবৃদ্ধ, তাই তাদের সাথেথাকা প্রয়োজন। অথচ অন্যান্য ভাই বোনও পিতা-মাতার সাথেই থাকে, আর অন্যান্য ভাই-বোন না থাকলেও পিতা-মাতার সার্বিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য এমন নয় যে তারা পৃথক থাকতে পারবে না। এটি শুধু ছেলের পিতামাতার হঠকারিতা হয়ে থাকে, আর কিছু নয়। ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলে? আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَآ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ

(সূরা আন্-নূর: ৬২)

অর্থাৎ অন্ধের বিরুদ্ধে কোন দোষ বর্তাবে না, আর খোঁড়ার বিরুদ্ধেও না আর রুগীদের বিরুদ্ধেও কোন দোষ বর্তাবে না, আর তোমাদের উপরও

কোন দোষ বর্তাবেনা যদি তোমরা নিজেদের ঘর থেকে বা পিতা-পিতামহের ঘর থেকে খাও বা মায়েদের ঘর থেকে খাও। এটি এক দীর্ঘ আয়াত, কিন্তু এ অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরে শ্বাশুড়ি ও পুত্রবধুর ঝগড়ার অভিযোগ করতে থাকে। কুরআনী শিক্ষা যদি মেনে চলা হয় তাহলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। দেখ, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, ঘর পৃথক পৃথক হওয়া উচিত। মায়ের ঘর পৃথক হবে আর বিবাহিত ছেলে-মেয়ের ঘর পৃথক হবে। "

(হাকায়েকুল ফুরকান ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৩)

ঘর যদি পৃথক হয় তবেই খাবারের প্রশ্ন আসবে। অতএব, কোন বাধ্য-বাধকতা যদি না থাকে তাহলে পৃথক ঘর নেয়া উচিত। পৃথক ঘর থাকলে যেখানে শ্বাশুড়ি-পুত্রবধুএবং ননদ-ভাবীর সমস্যার সমাধান হবে, সেখানে ছেলে এবং মেয়ের নিজ নিজ দায়িত্ববোধের চেতনাও বৃদ্ধি পাবে।

এখানে এটিও বলতে চাই যে, অনেকেই মেয়েদের বিয়ের পূর্বে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে যে তার নিজের ঘর আছে কি-না অর্থাৎ সে ঘরের মালিক কি-না, যদি না থাকে তাহলে বিয়ে দিবে না। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি আচরণ। অতএব জাগতিক লোভ লিপ্সার পরিবর্তে মেয়েপক্ষের উচিত ছেলের ধর্ম দেখা, সে ধার্মিক কি-না; ঘর তো ধীরে ধীরে হয়েই যায়, যদি ঘরে প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা থাকে।

অনুরূপভাবে, কোন কোন জায়গা থেকে বা কোন কোন দেশ থেকে আমার কাছে এই অভিযোগও আসে যে, আমাদের কতক মুরব্বী যারা পাশ করেছে, মানুষ তাদের কাছে এজন্য মেয়ে দিতে চায় নাযে, সে মুরব্বী, সে ওয়াকফে জিন্দেগী। এটিও ভ্রান্তরীতি, কেননা ধার্মিকতা দেখা উচিত।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের নসীহত করছেন যে, মহিলাদের কথা শুনে তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত করে বসো না, আর তাদের সাথে ভ্রান্ত আচরণ বা দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের কথাকে অপছন্দ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا- (সূরা আন্-নিসা: ২০) অর্থাৎ আর তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর, সুন্দর ব্যবহারের মাঝে জীবন অতিবাহিত কর। 'ফা ইন কারেহতুমুহুন্না' (যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর) 'ফা আসা আন তাকরাহু শাইয়ান'? হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ ? অথচ আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলেন যে, "হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! দেখ, তোমাদের স্ত্রীর কোন কথা যদি অপছন্দ হয় তাহলেও তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। আল্লাহ্ বলছেন, তিনি এতে কল্যাণ রেখে দিবেন। হতে পারে একটি কথা সত্যিকার অর্থে ভাল, কিন্তু তোমার কাছে তা অপছন্দনীয় মনে হয়।"

(খুতবাতে নুর পৃষ্ঠা: ২৫৫)

অতএব, যে সমস্ত স্বামীরা স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে বা সুন্দর ব্যবহার করে না বা মহিলাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না বা তাদের কোন কথা অপছন্দ করে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে বা অন্যায় ব্যবহার করে বা দুরাচরণ করে, তাদের জন্য নসীহত হল মহিলাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। স্ত্রীদের যে সমস্ত কথা তোমাদের দৃষ্টিতে বাহ্যত অপছন্দনীয় সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো কর না। কেননা, বাহ্যিক অপছন্দনীয় কথায়ও কল্যাণ এবং বরকত অন্তর্নিহিতথাকতে পারে। আর তাড়াহুড়ো বাতড়িঘড়ি করে পাছে তুমি সেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাও।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নসীহত করেছেন, আর পুরুষদের তা নিজেদের সামনে রাখা উচিত। পুনরায় পুরুষদের দ্বিতীয় বিয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনার কারণে অনেক সমস্যা মাথাচাড়া দেয়, ঘরে ঝগড়া-বিবাদ বিরাজ করে। পুরুষদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে দ্বিতীয় বিয়ের যদি অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে এবং বৈধ প্রয়োজনের নিরিখে দেওয়া হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, সন্তান-সন্ততিও আছে, হাসি-খুশি আনন্দমুখর পরিবার, অথচ এখানকার প্রভাবের কারণে বা আল্লাহ্ তা'লা কিছুটা স্বচ্ছলতা দিলে মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিয়ে করবেবা অবৈধ বন্ধুত্ব স্থাপন করে বিয়ে করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, তা সামনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আইনকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনভাবেই প্রয়োগ করা উচিত নয়। আর এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যার ফলে এটি কেবল প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যহৃত হতে পারে; প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্মরণ রেখো যে, এমনটি করা পাপ। আল্লাহ্ তা'লা বার বার বলছেন, কামপ্রবৃত্তি যেন তোমাদের উপর কোনভাবে প্রভুত্ব করতে না পারে। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাকওয়া। তিনি বলেন, প্রায়শ শরীয়তের অনুমতিকে ঢাল বানিয়ে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যদি বিয়ে করা হয় তাহলে এর ফলাফল এটি ছাড়া আর কী হবে যে, অন্য জাতি আপত্তি করে বলবে যে, বিয়ে করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন কাজই নেই। নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে ঢাল বানিয়ে যদিতুমি বিয়ে কর তাহলে এটি অবৈধ। কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে তোমার পূর্বের বিবিদের তালাক দিয়ে দিবে, আর নতুনমহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে বিয়ে করবে– এটি ভ্রান্ত রীতি। তিনি বলছেন, আর মানুষ যদি এই কারণে আপত্তি করে, তবে তাদের আপত্তি যথাযথ হবে যে, বিয়ে করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন কাজ নেই। তিনি বলেন, শুধু ব্যভিচারকেই পাপ বলা হয় না, বরং অন্যায় কাম-বাসনা হৃদয়ে বাসা বাঁধাও পাপ। মানুষের জীবনে জাগতিক ভোগ-বিলাস নামে মাত্র থাকা উচিত বা খুব কম হওয়া উচিত, (জাগতিক ভোগ-বিলাস যৎসামন্য হওয়া উচিত)। فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا (সূরা আত্-তওবা: ৮২) অর্থাৎ কম হাসো আর অনেক বেশি ক্রন্দন বা অশ্রুপাত কর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজস্র জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্তথাকে আর সে দিবারাত্র স্ত্রীদের নিয়ে মগ্ন আর মত্ত থাকে, তার হৃদয় বিগলিত হবে কখন আর সে ক্রন্দন করবে কখন? আর অন্যান্য বৃথা কার্যকলাপেরও একই অবস্থা যেগুলোতে মানুষ লিপ্ত হয়। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হল তারা এক কথার সমর্থনে ওঅনুসরণে পুরোপুরি হারিয়ে যায়, আর এভাবে খোদার মূল ইচ্ছা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। যদিও আল্লাহ্ তা'লা কিছু জিনিস বৈধ আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সারাটা জীবন এরই জন্য উৎসর্গ করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলছেন যে, يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (সূরা আল্-ফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ তারা তাদের প্রভুর জন্য সারাটি রাত সেজদা এবং কিয়ামে অর্থাৎদণ্ডায়মান অবস্থায়অতিবাহিত করে। দেখ, দিবারাত্র যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছনেই নষ্ট করে তার রাত কিভাবে ইবাদতে অতিবাহিত হতে পারে? সে তো বিয়ে করার মাধ্যমে খোদার জন্য শরীক স্থির করে। মহানবী (সা.)-এর নয় জন স্ত্রী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি সারা রাত খোদার ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। তিনি আরো বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্র মূল ইচ্ছা হল, তোমাদের উপর যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা প্রভুত্ব করতে না পারে। তাকওয়ার পরিপূর্ণতার জন্য যদি সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পার। দ্বিতীয় বিয়েও তাকওয়ার উদ্দেশ্যে করা উচিত। অতএব, বিয়ে বৈধ; কিন্তু যারা বিয়ের বাসনা রাখে বা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনা যাদের মাথায় ছেয়ে আছে, তাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে বিয়ে করছে নাকি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এমন করছে।

পুনরায় তিনি বলেন, "তাই স্মরণ রাখা উচিত, যারা কামনা-বাসনার দাসত্বে একাধিক বিয়ে করে তারা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে। প্রতিটি দিন যা উদীত হয় আর প্রতিটি রাত যা আসে– যদি সে তিক্ততার মাঝে জীবন না কাটায়, আর কম কাঁদে বা আদৌ না কাঁদে এবং বেশিহাসে, তাহলে স্মরণ রেখ, এটি ধ্বংসের লক্ষণ।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৭)

পুনরায় মহিলাদেরকেও তিনি নসীহত করেছেন যে, যদি বৈধ প্রয়োজনে পুরুষ বিয়ে করতে চায় তাহলে হৈচৈ করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, তোমাদের দোয়া করার অধিকার আছে যে আল্লাহ্ যেন তোমাদের জীবনে এই সমস্যা আসতেই না দেন। পুরুষদেরকে যেভাবে বলেছেন যে, শুধু কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিয়ে করা উচিত নয়,মহিলাদেরকেও তিনি নসীহত করেছেন।

তিনি (আ.) বলছেন, 'আমাদের এ যুগে মহিলারাও কিছু বিশেষ বিশেষ বিদআতে লিপ্ত। তারা একাধিক বিয়ের অনুমতিকে অত্যন্ত অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে, যেন তাদের এতে ঈমানই নেই। তারা জানে না যে, আল্লাহ্র শরীয়তে সকল পরিস্থিতির চিকিৎসা রয়েছে। অতএব, ইসলামে যদি একাধিক বিয়ের বিষয়টা না থাকত তাহলে এমন পরিস্থিতি, যেক্ষেত্রে পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য হয়, এই শরীয়তে তার কোন বিহিত থাকত না। উদাহরণস্বরূপ, যদি মহিলা পাগল হয়ে যায় বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় বা চিরদিনের জন্য এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয় যা অকেজো করে দেয় বা এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন মহিলা আর কোন কাজের থাকে না আর অকেজো হয়ে যায় আর পুরুষও যদি নিরুপায় হয় এবং সে যদি স্ত্রী ব্যতীত থাকতে না

খুতবার শেষাংশ.....

পারে, এমন পরিস্থিতিতে পুরুষের শক্তি-বৃত্তির উপর দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দেয়া একটা অন্যায় বা যুলম। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার শরীয়ত এইসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখেই পুরুষদের জন্য পথ খোলা রেখেছে। আর বাধ্যবাধকতার সময় মহিলাদের জন্যও পথ খোলা আছে যে, পুরুষ যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলে সালিশেরমাধ্যমে খোলা নিতে পারে, যা তালাকের স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ্‌র শরীয়ত ঔষধ বিক্রেতার দোকানের মত। অতএব দোকান যদি এমন না হয়, যাতে সকল রোগের ঔষধ থাকবে, তাহলে সেই দোকান চলতে পারে না। তাই চিন্তা কর, এটি কি সত্য নয় যে পুরুষের এমন অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যে পরিস্থিতিতে তারা দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়? সেই শরীয়ত কোন কাজের নয় যাতে সব সমস্যার সমাধান নেই। দেখ, ইঞ্জিলে শুধু ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তালাকের অনুমতি আছে আর অন্য শত শত এমন বিষয় বা কারণ আছে যা নর-নারীর মাঝে চরম শত্রুতা সৃষ্টি করে, এর কোন বিহিত করা হয় নি।'

মহিলাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, 'হে নারীগণ! চিন্তা করো না, যেই গ্রন্থ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা ইঞ্জিলের মত মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষি নয়। এই গ্রন্থে যেভাবে পুরুষদের অধিকারের সংরক্ষণ করা হয়েছে, একইভাবে নারীদের অধিকারেরও হেফাযত করা হয়েছে। যদি মহিলা পুরুষের একাধিক বিয়েতে অসুন্তষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সে সালিশ বা বিচারকের মাধ্যমে খোলা নিতে পারে। খোদার জন্য আবশ্যক ছিল, যে সমস্ত বিষয়ে মুসলমানদের সমস্যা দেখা দিতে পারে, নিজ শরীয়তে তা উল্লেখ করা, যেন শরীয়ত অসম্পূর্ণ না থাকে। সুতরাং হে মহিলাগণ, হে নারীগণ! তোমাদের স্বামীরাযদি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তাহলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যেন খোদা তোমাদেরকে সমস্যা এবং পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেন। এই দোয়া করার অনুমতি আছে যে, স্বামী যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে এই সমস্যা এবং পরীক্ষা থেকে আল্লাহ্ তা'লা যেন নিরাপদ রাখেন, অর্থাৎ স্বামী বিয়েই না করে। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে সেই পুরুষ চরম অত্যাচারী এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য যে দুই বিয়ে করে সুবিচার করে না। কিন্তু তোমরা স্বয়ং আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কাজের জন্য প্রশ্ন করা হবে।যদি তোমরা খোদার দৃষ্টিতে নেক হও বা পুণ্যবতী হও তাহলে তোমাদের স্বামীকেও পুণ্যবান করা হবে। যদিও শরীয়ত বিভিন্ন প্রজ্ঞার কারণে একাধিক বিয়েকে বৈধ আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু তকদীরের রাস্তা তোমাদের জন্য খোলা রয়েছে। যদি শরীয়তের আইন তোমার জন্য অসহ্য হয়ে থাকে তাহলে দোয়ার মাধ্যমে তকদীরের যে আইন আছে সেটিকে কাজে লাগাও। কেননা, তকদীর শরীয়তের আইনের উপরও অনেক সময় প্রাধান্য রাখে। তাকওয়া অবলম্বন কর। ইহজগৎ আর এর সৌন্দর্যে লালায়িত হয়ো না।" (কিশতিয়ে নুহ, রূহানী খাযায়েন) আর তকদীর কী? তকদীর হল দোয়া কর আল্লাহ্ তা'লা যেন সেই পুরুষের হৃদয় থেকে দ্বিতীয় বিয়ের ধারণা ই দূর করে দেন। অর্থাৎ তার অনুমতি তো আছে, কিন্তু তুমি যদি দোয়া কর আর এমন দোয়া কর যা মন থেকে উদ্ভূত হবে, তাহলে হতে পারে তোমার সেই দোয়া গৃহিত হবে আর তুমি সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবে বা দূরে থাকবে, আর বিয়ের সেই পরিস্থিতিই সামনে আসবে না।'

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সদস্যদের, নর-নারী উভয় শ্রেণিকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন তাদের পারিবারিক সমস্যা আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুসারে সমাধান করেন। আর জাগতিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করার পরিবর্তে ধর্ম যেন প্রাধান্য পায়, খোদাভীতি বা খোদার ভয় এবং তাকওয়া যেন সব সময় অগ্রগণ্য থাকে। একইভাবে, নতুন বিয়ে-শাদীর সমস্যাও আল্লাহ্ তা'লা দূরীভূত করুন, অনেক সমস্যা সামনে আসছে। ছেলে-মেয়েদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, আর এই কথা বুঝার সামর্থ্য দিন যে, বিয়ে-শাদী শুধু জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয় বরং ধর্মকে অগ্রগণ্য করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মের পথে পরিচালনার জন্য যেন হয়, আর পবিত্র বংশবিস্তার যেন এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত বা নিরাপদ থাকে, আর ইসলামের সেবক হিসেবে বড় হয় আর এভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে।

নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযা পড়াব। দু'টো হাজের জানাযা রয়েছে আর দু'টো গায়েব। প্রথম জানাযা জনাব মোহাম্মদ নওয়াজ মোমেন সাহেবের, যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন, তার পিতার নাম খোদাবখশ মোমেন সাহেব। তিনি ২০১৭ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮৫ বছর বয়সে জার্মানিতেইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মোমেন জী সাহেবের জামাতা ছিলেন। তার পিতা সম্ভবত ১৯২২ সনে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার পিতার সন্তানরা জন্মের সময়ই মারা যেত, তাই গয়ের আহমদীরা খোঁটা দিত যে, আপনি যেহেতু আহমদী হয়েছেন তাই আপনার সন্তানরা মারা যায়। তখন তার পিতা তার জন্মের পর আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, আমার এই ছেলে যদি জীবিত থাকে তাহলে ইসলামের সেবার জন্য তাকে উৎসর্গ করব। অতএব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই শিশু এবংএরপর আরো চারজন সন্তান জীবিত থাকে, আর তারা সবাই দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। তার পিতা জন্মের সময়ই তাকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে পড়ালেখা শেষ করেন। এরপর সারা জীবন জামা'তের সেবায় কাটিয়েছেন। রাবওয়ার আল-ফযল দপ্তর, দারুল কাযা এবং ওসীয়্যত অফিসে দীর্ঘকাল কাজের সুযোগ হয়েছে। ১৯৬৯ সনে জার্মানি চলে যান, সেখানেও বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবাকরেছেন। তার মাঝে তবলীগের গভীর উন্মাদনা এবং আগ্রহ ছিল। নামায-রোযায় অভ্যস্ত, পরম ধৈর্যশীল, স্বল্পভাষী, ধার্মিক এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন বুযুর্গ মানুষ ছিলেন। কুরআনের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ছিল, জ্ঞানের প্রসার-প্রচারের পাশাপাশি তারতিলের সাথে কুরআন পড়ানোর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক মেয়ে এবং এক ছেলে রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় জানাযা এখানকার জনাব সৈয়দ রফিক আহমদ সাফির সাহেবের, যিনি সার্বিটন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন । তার পিতা ডাক্তার সাফির উদ্দিন সাহেব কুমাসি ঘানায় আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। সৈয়দ রফিক সাফির সাহেবের জন্ম হয় লন্ডনে আর আশৈশব জামাতি কাজে তিনি সক্রিয় ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, সেক্রেটারী আতফাল, আনসারুল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় মজলিসে কায়েদ সেহতে জিসমানী ছাড়াও কায়েদ উমুমী হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে সার্বিটন জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। নামায রীতিমত পড়তেন, তাহাজ্জদগুযার, দোয়ায় অভ্যস্ত, মিশুক ও শান্ত প্রকৃতির অধিকারী, খুবই নেক এবং নিষ্ঠাবান এক মানুষ ছিলেন। তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা ছাড়াও স্ত্রী, দুই কন্যা এবং দুই পুত্র তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার স্ত্রী লিখেন, তিনি খুবই নরম প্রকৃতির, শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সন্তান-সন্ততিদেরকে গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সাথে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং বাজামাত নামায পড়াতেন। বিয়ের পর থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতি কাজে নিয়োজিত ছিলেন, মানুষের সমস্যা সমাধান ও আর্থিক সাহায্য করা তার অভ্যাসের অন্তর্গত ছিল। খুবই নেক, সরলমতি এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এক মানুষ ছিলেন।

তার জামা'তের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট লেখেন যে, তার একটি ভালো অভ্যাস ছিল যে, প্রত্যেক খুতবা জুমুআ সম্পর্কে এশার নামাযের পর শিশুদের প্রশ্ন করতেন আর সঠিক উত্তর দিলে পুরস্কারও দিতেন। এর মাধ্যমে শিশুদের মাঝে খুতবা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হত। জামা'তের কাজের ব্যাপারে সব সময় সচেতন এবং সোচ্চার থাকতেন। এই হল দু'টো হাজের জানাযা যার উল্লেখ আমি এইমাত্র করলাম।

এছাড়া দু'টো গায়েবানা জানাযাও হবে।একটি হল ডা. মির্যা লাঈক আহমদ সাহেবের, যিনি সাহেবযাদা মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পৌত্র। তিনি ২০১৭ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাহের হার্ট ইনিস্টিটিউট-এ ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার শ্রদ্ধেয়া মা এখনও জীবিত আছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই আঘাত সহ্য করার শক্তি দিন। তিনি রাবওয়াতেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এরপর মুলতান মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস করেন। রাবওয়াতেই প্র্যাকটিস করতেন। গরীবদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। আর অধিকাংশ দরিদ্রই এটি লিখেছে যে, তিনি আমাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন এবং আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। বরং সপ্তাহের একদিন গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করার জন্য ওয়াক্‌ফ করে রেখেছিলেন। এছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন কর্মী এবং গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসাকরতেন। তার প্রথম বিয়ে সৈয়্যদা ফায়েযা সাহেবার সাথে হয়, এই ঘরে তার দুই পুত্র রয়েছে। তার দ্বিতীয় বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কন্যা আমাতুশ্ শাকূর সাহেবার সাথে হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন এবং তার প্রতি রহম করুন।

দ্বিতীয় জানাযা গায়েব জনাব আমিনুল্লাহ খান সালেক সাহেব-এর, যিনি আমেরিকার সাবেক মিশনারী ছিলেন।তিনি ২০১৭ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার আমেরিকায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন?। মরহুম আমেরিকা, লাইবেরিয়া এবং ইংল্যান্ডে মুবাল্লেগ হিসেবে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 6 th April, 2017 Issue No. 14

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর....

অভিবাসীদের আগমণ নিয়ে পরোয়া করে নি; মুসলিম হোক বা অমুসলিম বা আফ্রিকান। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন আর সে কারণেই এসব হচ্ছে, এটি এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে কতক ইউরোপীয় জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সর্বত্র নৈরাশ্যের অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর একটি মহান অর্জন হল ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন গঠন করা, কেননা এর মাধ্যমে মহাদেশটি একতাবদ্ধ হয়েছে। অতএব, আপনাদের উচিত হবে এ একতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকল প্রচেষ্ঠা চালিয়ো যাওয়া। সাধারণ জনগণের মনে বিদ্যমান উৎকণ্ঠা ও ভীতিসমূহকে অবশ্যই দূর করতে হবে। একে অপরের সমাজকে রক্ষার খাতিরে আপনাদের উচিত হবে একে অপরের যেক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ মেনে নেওয়া, আর অবশ্যই প্রতিটি দেশের জনগণের কেবল যৌক্তিক ও ন্যায় সঙ্গত দাবিই উত্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন যে ইউরোপের শক্তি এর একতাবদ্ধ ও একত্রে এক হয়ে থাকার মধ্যে নিহিত। এরূপ কেবল এখানে ইউরোপে আপনাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, বৈশ্বিক পর্যায়ে এ মহাদেশের শক্তি ও প্রভাব বজায় রাখার কারণ হবে। বস্তুতঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে, আমাদের প্রচেষ্টা এই হওয়া উচিত যে পুরো পৃথিবী যেন একতাবদ্ধ হয়। মুদ্রার দিক থেকে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। মুক্ত ব্যবসা ও বানিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত আরও অভিবাসনে বিষয়ে সুসংহত ও বাস্তবমুখী নীতিসমূহ গড়ে তোলা উচিত, যেন বিশ্ব একতাবদ্ধ হতে পারে। সারকথা হল এই যে, সকল দেশের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা উচিত যেন বিভক্তির স্থলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয় তবে শীঘ্রই দেখা যাবে যে, বিদ্যমান সংঘাত সমূহের অবসান হবে এবং এর স্থলে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হবে, এ শর্তসাপেক্ষে যে, প্রকৃত ন্যায়ের চর্চা করা হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে। আমাকে গভীর অনুতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, যদিও এটি একটি ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। যদি তারা একে অপরের সহযোগিতা করতো এবং একতাবদ্ধ হত, তবে তাদেরকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ ও চাহিদা পুরণে সর্বদা পশ্চিমা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হত না।

এ কথাগুলোর সাথে আমি এখন বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমতঃ ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও প্রাথমিক একটি শিক্ষা এই যে, একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কথা ও কাজ থেকে অপর সকল শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ থাকে। এটি একজন মুসলমানের সেই সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদান করেছেন। এই মৌলিক ও অনুপম সুন্দর নীতি শোনার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনে আর কোন অবকাশ থাকে কি? নিশ্চয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যারা নিজ কথা ও কাজে অন্যায় ও বিদ্বেষ ছড়ায় তারাই শাস্তি প্রদানের যোগ্য। এভাবে, স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে যদি সকল পক্ষ এই স্বর্ণালী নীতির গন্ডীর মধ্যে থাকে,তাহলে আমরা দেখবো যে কখনো বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে না। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হবে না আর লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হবে না। যদি এই প্রকৃত ইসলামী নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তাহলে দেশগুলোর অভ্যন্তরে জনসাধারণ একে অপরের অধিকার ও অনুভুতির বিষয়ে যত্নবান হবে এবং সরকারগুলো সকল নাগরিককে রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের সাথে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও সহানুভুতির স্পৃহা নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করবে।

আরেকটি মূলনীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, এটা আব্যশক যে সকল পক্ষ সর্বদা কোন প্রকারের দম্ভ বা অহমিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। মহানবী (সা.) তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে এই বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি অন্য কোন জাতির উপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির কোন মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আফ্রিকান বা এশীয় বা বিশ্বের অন্য কোন অংশের মানুষের। জাতি, বর্ণ ও গোত্রের ও বৈচিত্র কেবল আমাদের পরিচিতি ও সনাক্তকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সত্য এই যে, আধুনিক বিশ্বে আমরা সকলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ এমনটিক ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে টিকে থাকতে পারবে না।আফ্রিকান দেশগুলি বিচ্ছিন্ন থেকে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে না, আর এশীয় দেশগুলোর পক্ষেও বিশ্বের কোন অংশের দেশ বা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয় উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বানিজ্যকে আপনার সাদরে স্বাগত জানাতে হবে। গত কয়েক বছরের ইউরোপের তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে কম বেশি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে তা থেকে বিশ্ব আজ কিভাবে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তদুপরি বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বা অন্য কোন দক্ষতায় উন্নতি করার জন্য দেশগুলোর একে অপরের সাহায্য সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে।

আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীর মানুষকে, তারা আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা অন্য কোন স্থান থেকে আসুন না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অসাধারণ মেধাগত যোগ্যতাসমূহ প্রদান করেছেন। যদি সকল পক্ষ তাদের নিজ খোদা-প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহ যথাসাধ্য বিশ্ব মানবতার উন্নতি কল্পে প্রয়োগ করে,তাহলে আমরা দেখবো যে,বিশ্ব এক শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, যদি উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত,বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি-অগ্রগতিকে দমন করতে চায় আর সব দেশের উর্বর ও মেধাবী মস্তিষ্কের ব্যক্তিদের সুযোগ না দেয়, তাহলে সন্দেহ নাই যে,অস্থিরতা বিস্তার লাভ করবে এবং এর ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করবে।

খুতবার শেষাংশ....

কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ১৯৩৬ সনে আভিরোয়াল নিবাসী আব্দুল মজিদ খান সাহেবের ঘরে তার জন্ম হয়। শৈশবেই জামা'তের খেদমতের জন্য তার পিতা-মাতা তাকে উৎসর্গ করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তাহরীকে তিনি তার পুত্রকে ওয়াক্ফ করেন। মরহুমের মাতা খুবই আনন্দিত ছিলেন আর বলতেন যে, তার স্বামী অর্থাৎ আব্দুল মজিদ খান সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সানীর প্রেরণায় নিজের ছেলেকে ওয়াকফ করেন, আর কাদিয়ান থেকে ফিরে এসে বলেন যে, আমি তোমার পুত্রকেও ওয়াকফ করেছি যেন এই অভিযোগ না থাকে যে, প্রথম স্ত্রীর পুত্র ডাক্তার নাসীর খান সাহেবকে ওয়াকফ করেছেন আর আমার পুত্রকে করেন নি। ১৯৪৫ সনে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায়তিনি নিজেই জীবন উৎসর্গ করার আবেদন করেন। ১৯৪৯ সনে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ালেখা শেষ করার পর জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সনে মৌলবী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৫৭ সনে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৫৮ সনে শাহেদ আর ১৯৫৯ সনে বিএ পাশ করেন। ১৯৫৮ সনে প্রথমবার তার পদায়ন হয়। এরপর ১৯৬০ সনের ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল ১৯৬৩ সন পর্যন্ত আমেরিকায় মুবাল্লেগ হিসেবে খেদমতের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৬৬ সনের পর কিছুকাল তিনিআমানত বিভাগে সাময়িকভাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তার লাইবেরিয়ায় কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৬০ সনে ২৩ বছর বয়সে তার প্রথম পদায়ন হয় আমেরিকায়। খুব আবেগউচ্ছ্বাসপূর্ণ মুবাল্লেগ ছিলেন। তিনি পত্র-পত্রিকা এবং রেডিওর মাধ্যমে তবলীগের সুযোগ পেয়েছেন এবং তবলীগ করতেন। লাইবেরিয়ায় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সেখানকার প্রেসিডেন্ট টাবম্যান তাকে মাসিক মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাকে দিয়েদোয়া করাতেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন লাইবেরিয়া সফর করেন তখন প্রেসিডেন্ট টাবম্যান হুযূর (রাহে.)-এর সম্মানে এক সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করেন আর আমিনুল্লাহ খান সাহেব সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট টাবম্যান বলেন যে, He is very forceful. তখন হুযূর (রাহে.) উত্তরে বলেন,He is forceful without choosing any force.আমিনুল্লাহ খান সাহেব-এর ইংল্যান্ডেও পদায়ন হয়, ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি এখানে কাজ করেন। এরপর স্বাস্থ্যগত সমস্যারকারণে তাকে অবসর দেয়া হয়। তার বিয়ে হয়েছে ইকবাল শাহ সাহেবের কন্যা বুশরা শাহ সাহেবার সাথে, যিনিহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী নাইরোবি নিবাসী ডাক্তার বেলায়েত শাহ সাহেবের পৌত্রি ছিলেন। তিনি আপা তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবা,যিনি খলীফা সালেস (রাহে.)-এর স্ত্রী ছিলেন, তার বড় ভাই ছিলেন। তিনি এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমকে স্বীয় করুণায় সিক্ত করুন। সকল মরহুমের প্রতি মাগফিরাত এবং দয়ার আচরণ করুন, তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি যেভাবে বলেছি তাদের জানাযা হবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir